নোনা জলে সোনার ফলন

"কাঁকড়া চাষ" ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
বাস্তবায়নেঃ নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন

NOWABENKI GONOMUKHI FOUNDATION
Shyamnagar, Satkhira

নোনা জলে সোনার ফলন

“কাঁকড়া চাষ” ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায়ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
বাস্তবায়নেঃ নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন

পল্লী
কর্ম-সহায়ক
ফাউণ্ডেশন

GONOMUKHI
NOWABENKI
FOUNDATION
Shyamnagar, Satkhira

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০১৩

উপদেষ্টা

মোঃ আলমগীর কবির, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এনজিএফ।

সম্পাদনায়

আল-ইমরান, টেকনিক্যাল অফিসার, ফেডেক প্রকল্প-১, এনজিএফ।

শামিম আহমেদ, টেকনিক্যাল অফিসার, ফেডেক প্রকল্প-২, এনজিএফ।

অর্থায়নে ও সার্বিক সহযোগিতায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশনায়

নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)

শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১ ২১৮১৯৭

ই-মেইল ঃ ngfbd1@yahoo.com

মুদ্রণে ঃ **সাকিব অফসেট প্রেস,** ৪৮, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

মোবাইল ঃ ০১৭১১ ৩০ ৮৫ ৮৩

মুখবন্ধ

সম্প্রতি আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানিতে নতুন একটি সম্ভাবনার উন্মোচন হয়েছে, সেটি হল কাঁকড়া চাষ। বাংলাদেশের জাতীয় রপ্তানি আয়ের উপাদানগুলোর মধ্যে কাঁকড়া ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিচ্ছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত মৎস্য সম্পদের মধ্যে চিংড়ির পরেই কাঁকড়ার অবস্থান। বাংলাদেশ বছরে ১৫০০ মেট্রিক টন কাঁকড়া রপ্তানি করে ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ উপার্জন করে থাকে। বর্তমানে সারাদেশে ২.৫-৩.০ লক্ষ লোক কাঁকড়া সংগ্রহ, মোটাতাজাকরণ ও বিপনন করেই জীবিকা নির্বাহ করছে। কেবলমাত্র সুন্দরবন এলাকায় প্রাায় ৫০-৬০ হাজার নারী-পুরুষ এ পেশার সাথে জড়িত। বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে কাঁকড়ার প্রচলন ব্যপকভাবে না হলেও চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এবং ইউরোপ মহাদেশে কাঁকড়ার ব্যপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ হতে বহির্বিশ্বে যে পরিমাণ কাঁকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে তার সম্পূর্ণই উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানি বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বাগেরহাট ইত্যাদি অঞ্চল হতে আহরিত হয়ে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলের যে সমস্ত ঘের, ছোট ডোবা, পরিত্যক্ত পুকুর চিংড়ি চাষের উপযুক্ত নয়, সে সমস্ত জায়গায় অতি সহজ ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক খাবার প্রয়োগের মাধ্যমে সঠিক পরিচর্যায় রপ্তানিযোগ্য কাঁকড়া উৎপাদন সম্ভব। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া চাষ হলেও তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় সাতক্ষীরা জেলায়। বাংলাদেশের উৎপাদিত মোট কাঁকড়ার ২৫% (এক চতুর্থাংশ) বা তার বেশী কাঁকড়া সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা, শ্যামনগর, আশাশুনি অঞ্চল হতে উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলে কাঁকড়া চাষ সাব-সেক্টরের বিভিন্ন পর্যায়ে ১৫ হাজারের বেশি নারী-পুরুষ জড়িত। নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) দীর্ঘদিন যাবৎ শ্যামনগর, আশাশুনি, দেবহাটা এলাকার গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারকে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শ্যামনগর উপজেলার কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর ফেডেক প্রকল্পেরর অর্থায়নে এনজিএফ "কাঁকড়া চাষ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের অর্জন সমূহ সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় আলোচনা করা হল। এই ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প কাঁকড়া চাষের এ সাব-সেক্টরের বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। সেই সাথে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষ উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

নভেম্বর, ২০১৩

মোঃ লুৎফর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
নওয়াবেঁকী গনমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)

এ সাব সেক্টরের বিকাশ তরান্বিত করতে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় আসা ২০০ জন চাষীকে পরামর্শ সেবা প্রদান অব্যাহত রেখে নতুন করে শ্যামনগর উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের ৬০০ জন চাষীকে নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে।

কাঁকড়া চাষের পটভূমিঃ সুপ্রাচীনকাল হতেই কাঁকড়া খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পূর্বে এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হত। বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে কাঁকড়ার তেমন প্রচলন না থাকলেও পৃথিবীর অনেক দেশে খাদ্য হিসেবে কাঁকড়ার ব্যপক চাহিদা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে কাঁকড়ার বানিজ্যিক উৎপাদনের প্রচলন ঘটে। প্রায় একশ বছর পূর্বে সর্বপ্রথম কাঁকড়ার বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় চীনে। এরপর ক্রমান্বয়ে থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে কাঁকড়ার বানিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। বাংলাদেশে বানিজ্যিকভাবে কাঁকড়া চাষের গোড়া পত্তন হয় নব্বই দশকের শুরুর দিকে। উপকূলীয় জেলা; খুলনা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বাগেরহাটে বর্তমানে বানিজ্যিক কাঁকড়া চাষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যা এসব অঞ্চলের জনগণের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। মাছ অপেক্ষা প্রতিকূল পরিবেশে দ্রুত উৎপাদিত হওয়ায় কাঁকড়া হাঁস-মুরগি ও পোল্ট্রির খাবার তৈরীতে জনপ্রিয় উপাদান। পুরুষ কাঁকড়ার তুলনায় মেয়ে কাঁকড়ায় লিপিডের পরিমাণ বেশি থাকে তাই মেয়ে কাঁকড়ার স্বাদ এবং চাহিদা দুই বেশি। কাঁকড়ায় প্রায় ১৭-২০% আমিষ থাকায় এটি মানুষ এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশের জন্য আমিষের ভালো উৎস। অনেকেই কাঁকড়াকে পুষ্টিমান, স্বাদ ও আমিষের কারনে অন্যান্য মাছ, হাঁস-মুরগির মাংস এবং গরুর মাংসের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন।

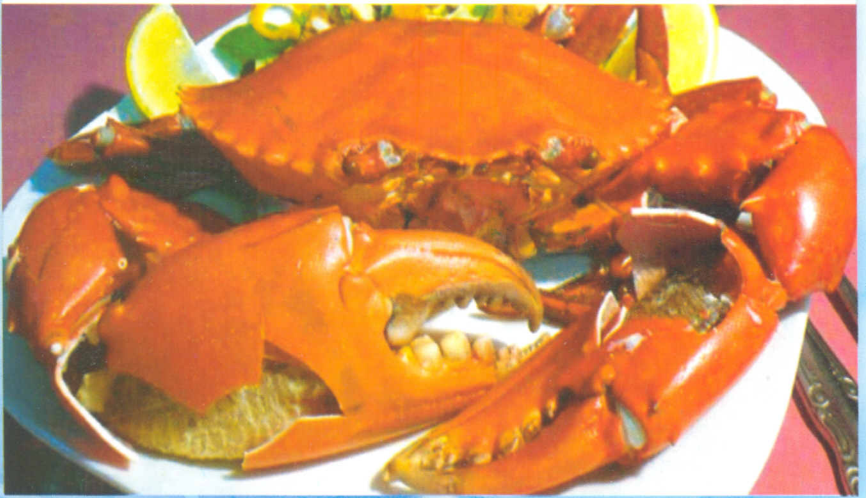

কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ

বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে প্রায় ১৬ টি প্রজাতির কাঁকড়া দেখতে পাওয়া যায়। এই ১৬ টি প্রজাতির মধ্যে ৬ টি প্রজাতি মানুষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। বাংলাদেশের জলাভূমিতে প্রাপ্ত ১৬ প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে ১৩ প্রজাতি সামুদ্রিক এবং ৩ প্রজাতি স্বাদু পানিতে বাস করে। ১৩ প্রজাতির সামুদ্রিক কাঁকড়ার মধ্যে ১০ প্রজাতি নদী অববাহিকায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে সকল প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে *Scylla Serrata* প্রজাতির কাঁকড়া বানিজ্যিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত। *S. serrata* সাধারনত আঞ্চলিকভাবে শীলা কাঁকড়া নামে পরিচিত। শীলা কাঁকড়া হাওয়াই, জাপানের দক্ষিন অংশ, তাইওয়ান, ফিলিপাইন হতে অস্ট্রেলিয়া, লোহিত সাগর, পূর্ব ও দক্ষিন আফ্রিকাসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে বসবাস করে। নদী অববাহিকা অঞ্চলের মধ্যে সুন্দরবন এলাকায় কাঁকড়া পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি।

চিত্রঃ শীলা কাঁকড়া

বানিজ্যিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ *S. serrata* প্রজাতি মূলত সাগরে জন্ম লাভ করে জোয়ারের পানিতে উপকূলীয় এলাকায় বিস্তার লাভ করে থাকে। কাঁকড়া সাধারণত দুই ভাবে প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকৃতির কাঁকড়া বৃহৎ ঘেরে বাঁশের পাটা বা নাইলনের নেট ব্যবহার করে অথবা বাঁধ দিয়ে চাষ করা হয়ে থাকে। আবার ক্ষুদ্র আকৃতির জায়গায় যেখানে লোনা পানির প্রাপ্যতা এবং তাপমাত্রা (৫-২৫ পিপিটি, ১২-২৫ ডিগ্রী সেঃ) সেখানে বাঁশ এবং নাইলনের নেট ব্যবহার করে ছোট ঘেরে গ্রেড ফেল কাঁকড়া ২-৪ সপ্তাহ পরিচর্যা করে গোনাড পরিপূর্ণ ও খোলস শক্ত করে বিক্রয় উপযোগী করা হয়। আমাদের দেশে আঞ্চলিক ভাবে কাঁকড়া চাষ বলতে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণকেই বোঝায়। কাঁকড়ার বিভিন্ন গ্রেড রয়েছে। আকার ওজন এবং গোনাড এর পরিপক্বতার উপর ভিত্তি করে কাঁকড়ার গ্রেডিং করা হয়। পুরুষ কাঁকড়ার মধ্যে যাদের খোলস নরম থাকে এবং স্ত্রী কাঁকড়ার মধ্যে যাদের গোনাড পর্যাপ্ত পরিপক্ক হয়না সে ধরণের কাঁকড়াকে গ্রেড ফেল কাঁকড়া বলে। অপরিপক্ব গোনাড সম্পন্ন স্ত্রী কাঁকড়াকে হিজড়া কাঁকড়া বলে। বন থেকে সংগৃহীত কাঁকড়ার চল্লিশ শতাংশই গ্রেড ফেল থাকে। বাজারে গ্রেড কাঁকড়ার ভাল দাম থাকলেও গ্রেড ফেল কাঁকড়ার বাজার মূল্য সাধারণত অনেক কম হয়। প্রতি ৫টি হিজড়া কাঁকড়ার সাথে ১টি পুরুষ কাঁকড়া নির্ধারিত উপায়ে ২০-৪০ দিন লালন পালন করলে হিজড়া কাঁকড়া গোনাড ডিমে পরিপূর্ণ হয়ে তা স্ত্রী কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হয়। পুরুষ গ্রেড ফেল কাঁকড়াকে নির্দিষ্ট উপায়ে ৩-৪ দিন লালন পালন করলে তাদের খোলসগুলো শক্ত হয়ে এগুলো গ্রেড কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হয়।

কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ- সম্ভাবনা নাকি শঙ্কা

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার জনগনের জন্য কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ একটি নতুন উদ্যোগ হলেও অতি অল্প সময়েই এই উদ্যোগ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের লাভজনক দিক বিবেচনা করে ক্রমশ অধিক সংখ্যক লোক এই চাষের দিকে ঝুকে পড়ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল কাঁকড়া চাষের জন্য উপযুক্ত হওয়ায় মূলত এ অঞ্চলেই কাঁকড়া চাষের ব্যাপকতা বেশি। বর্হিবিশ্বে রপ্তানিকৃত কাঁকড়ার মধ্যে প্রায় ৬৫% এ অঞ্চলে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ অবশ্যই একটি সম্ভাবনার নাম। গত অর্থবছরে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ডে ২৯ লাখ ৪৩ হাজার ৮০৯ ডলার মূল্যের কাঁকড়া রপ্তানি হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এসব দেশে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৫৯ হাজার ৮৩৪ ডলার এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে ১ কোটি ৩৫ লাখ ৩০ হাজার ৪০৯ ডলার মূল্যের কাঁকড়া রপ্তানি হয়েছে (দৈনিক জনতা, ৮.১১.২০১২)। শুধু রপ্তানি আয়ের বৃদ্ধি নয়, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ অন্যান্য চাষ পদ্ধতি থেকে অনেক বেশি সহজ এবং কম পুঁজির প্রয়োজন হওয়ায় চাষীরা দিন দিন কাঁকড়া চাষের প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। বিদেশের বাজারে কাঁকড়ার ব্যাপক চাহিদা থাকায় চাষকৃত কাঁকড়ার দামও ভালো পাওয়া যায়। এছাড়াও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ অসংখ্য বেকার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চিংড়ির চাষের সাথে তুলনায় দেখা যায়, ১২-১৫ শতক জমিতে কাঁকড়া চাষে অর্জিত মুনাফা প্রায় ৭ বিঘা জমিতে চিংড়ি চাষে অর্জিত মুনাফার সমান।

তাছাড়া এদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মাটি, পানি এবং পরিবেশ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের জন্য লোনা পানির পাশাপাশি পানিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ লোনা পানি এবং উপযুক্ত গুনাগুন সমৃদ্ধ কাদামাটি কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত বিকাশমান কাঁকড়ার চাহিদা এবং কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে এই অঞ্চলের আপেক্ষিক সুবিধা বিবেচনা করে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে কাঁকড়া চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে চাষীরা পূর্বের তুলনায় অধিক লাভজনকভাবে কাঁকড়া চাষে সমর্থ হচ্ছেন। ক্রমশ অধিক সংখ্যক লোক কাঁকড়া চাষে নিয়োজিত হচ্ছেন এবং কাঁকড়া চাষের এ সাব-সেক্টর দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। এর ফলে জাতীয় রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি উপকূলীয় অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এসব কারনে বলা যায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরন অবশ্যই একটি সম্ভাবনার নতুন দ্বার।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং কাঁকড়া চাষ

জলবায়ু পরিবর্তন এ মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হবে, এ কথা বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ফোরামে প্রতিনিয়ত আলোচিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশের সম্ভাব্য বিপর্যয়কে বাংলাদেশ সরকারের 'বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়' কর্তৃক নব্বইয়ের দশকে প্রণীত ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান (NEMAP)-এ দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (CRI) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্থ দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ইতিমধ্যে যে নেতিবাচক লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে তা হলো-

- লবনাক্ততা বৃদ্ধি
- বৃষ্টিপাত হ্রাস
- চরমভাবাপন্ন তাপমাত্রা
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি
- স্থায়ী জলাবদ্ধতা
- সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি
- জীবজন্তুর অবলুপ্তি
- কৃষিভিত্তিক উৎপাদন হ্রাস
- অর্থনৈতিক ক্ষতি
- জলবায়ুগত উদ্বাস্তুতা বৃদ্ধি

উল্লেখিত নেতিবাচক দিকগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায় যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী। সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে অধিক পরিমাণ লোনা পানির অনুপ্রবেশ এইসব অঞ্চলের উর্বর জমিতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যাপক ভাবে কমিয়ে দিয়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উপকূলবর্তী এসব মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কাঁকড়া চাষ হতে পারে লবনাক্ততা বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক তাপমাত্রা, স্থায়ী জলাবদ্ধতা, সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিস্থিতে অভিযোজিত পদক্ষেপ। বিগত বছরগুলোতে চিংড়ি চাষ করে অর্থনৈতিক ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনলেও বর্তমান সময়ে চিংড়ির রোগ-বালাই এর মহামারী, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বীতা বৃদ্ধি এবং পুশইন সমস্যার কারনে এই শিল্প এখন হুমকির মুখে। অপর দিকে আইলা ও সিডরের পর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগোষ্ঠী কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছে। এর মূল কারন হচ্ছে-

- কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণের আদর্শ পরিবেশ।
- অল্প পুঁজি ও স্বল্প সময়ে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ।
- কাঁকড়ার রোগ-বালাই অনেক কম।
- অধিক অভিযোজন ক্ষমতা।
- কম উৎপাদন খরচ।
- ভালো বাজার মূল্য।
- আর্ন্তজাতিক বাজারের অধিক চাহিদা।

তাই কাঁকড়া চাষ হতে পারে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির একটি মূল সঞ্জীবনী।

চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য সম্পদ। চিংড়ি বাংলাদেশের হিমায়িত রপ্তানি পণ্যের মধ্যে প্রথম। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের একটা বড় অংশ আসে এই চিংড়ি খাত হতে। তবে অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। চিংড়ি চাষের ফলে মাটির লবনাক্ততা দিন দিন বেড়েই চলছে। চিংড়ি চাষ একটি দীর্ঘ মেয়াদী কর্মকান্ড। চিংড়ি চাষে ঘেরের পানি দীর্ঘ সময় রেখে দিতে হয় তাই মাটির লবনাক্ততা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় এবং মাটি পরবর্তীতে কৃষিকাজ বা চিংড়ি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অপরিকল্পিত ঘের করার কারনে ঘেরের লবনপানি ভূ-তল দিয়ে ঘের সংলগ্ন পাশের জমিতে প্রবেশ করে কৃষি জমি আবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। চিংড়ি চাষে বেশ কিছু সার, কীটনাশক এবং এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় যা পানির সাথে মিশে অন্যান্য মাছের বংশ বৃদ্ধির ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু কাঁকড়া চাষে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার সুযোগ কম কারন কাঁকড়া চাষে কোন রকম এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়না। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বিঘা জমিতে ৪০ থেকে ৪৫ কেজি চিংড়ি উৎপাদন হয়ে থাকে। পাঁচ বিঘা জমিতে চিংড়ি চাষের আয় ব্যয় দেখানো হল।

বিবরণ	একক মূল্য (টাকা)/ উৎপাদন	পরিমান	মোট (টাকা)/ মোট উৎপাদন
উৎপাদন	৪৫ কোজ/বিঘা	৫ বিঘা	২২৫
জমি লীজ	৬,০০০	৫ বিঘা	৩০,০০০
পোনা ক্রয়	০.৬০	৬০,০০০	৩৬,০০০
সার ও ঔষধ		১৫০০	১,৫০০
শ্রমিক খরচ	৩০০	১০	৩,০০০
মোট খরচ			৭০,৫০০
বিক্রয়	৪৫০	২২৫	১,০১,২৫০
মুনাফা			**৩০,৭৫০**

কাঁকড়া চাষের সবচেয়ে সুবিধা হল এই চাষে খুবই অল্প পরিমান জমির প্রয়োজন হয়। কাঁকড়া চাষে অল্প পরিমান জমির চাহিদা থাকার কারনে কৃষি জমির উপর কোন রকমের চাপ সৃষ্টি হয়না। ফলে ফসলি জমিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। কাঁকড়া চাষ (মোটাতাজাকরণ) করতে খুবই অল্প সময় লাগে। কাঁকড়া চাষের সময় বহুবার পানি পরিবর্তন করা হয় ফলে চিংড়ি চাষের তুলনায় লবনাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। কাঁকড়া চাষের জমিগুলোতে প্রায় একমাস বা দুইমাস পর পর মাটি বের করে রোদে শুকানো হয় কিংবা পানি দিয়ে ধৌত করা হয় যার ফলে মাটির লবনাক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে পারেনা। কাঁকড়ার সম্পূর্ণ সরবরাহ প্রকৃতি থেকে আসলেও কাঁকড়া মূলত ধরা হয় বরশি বা থোপা দিয়ে। যার ফলে এটি প্রকৃতির অন্যান্য প্রজাতিকে হুমকির মুখে ফেলেছেনা। কাঁকড়া চাষের জন্য জমির পরিমান কম লাগে। তাই অল্প জমির মালিক এমন লোকজনও কাঁকড়া চাষ করতে পারে।

বিবরণ	পরিমান	মূল্য
জমি লীজ	১৫ শতক	৩,০০০
পাটা ক্রয়	২৮০ হাত	১৩,০০০
বাঁশ		৬,০০০
পাড় মেরামত		২,০০০
মোট স্থায়ী খরচ		২৪,০০০
কাঁকড়া ক্রয়	৯০ কেজি	২২,৫০০
কাঁকড়ার খাদ্য ক্রয়	১৪০ কেজি	৭,০০০
শ্রমিক খরচ		২,০০০
সার ও ঔষধ ক্রয়		২০০
যাতায়াত		২০০
প্রতি সাইকেলে মোট পরিবর্তনশীল খরচ		৩১,৯০০
প্রাথমিকভাবে মোট খরচ		**৫৫,৯০০**

কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের প্রতি সাইকেলে সময় লাগে ১৫ দিন। সুতরাং এক বছরে গড়ে ২০ সাইকেল মোটাতাজাকরণ পরিচালনা করা সম্ভব।

১৫ শতক জমিতে প্রতি সাইকেলে কাঁকড়ার উৎপাদন ৭৫ হতে ৮৫ কেজি। প্রতি বছরে (২০ সাইকেলে) কাঁকড়ার মোট উৎপাদন হবে ১৬০০ কেজি ।

প্রতি কেজি কাঁকড়ার বিক্রয়মূল্য ৫০০ টাকা ধরে ১৬০০ কেজি কাঁকড়ার বিক্রয়মূল্য হবে ৮,০০,০০০ টাকা।

প্রতি সাইকেলে মোট পরিবর্তনশীল খরচ ৩১,৯০০ টাকা হিসেবে ২০ সাইকেলে মোট খরচ হবে ৬,৩৮,০০০ টাকা। এক বছরে মোট স্থায়ী খরচ ২৪,০০০ টাকা।

এক বছরে ১৫ শতক জমিতে কাঁকড়া চাষে মোট খরচ =(৬,৩৮,০০০+২৪,০০০) টাকা= ৬,৬২,০০০ টাকা। এক বছরে ১৫ শতক জমিতে কাঁকড়া চাষে নীট লাভ = (৮,০০,০০০-৬,৬২,০০০) টাকা বা ১,৩৮,০০০ টাকা।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে উদ্যোক্তার নিজের শ্রম খরচ বিবেচনায় আনা হয়নি। উল্লেখ্য একজন চাষী নিজ শ্রমে সহজেই ২০ শতক জমিতে কাঁকড়া চাষ করতে পারে।)

উপরোক্ত বিশ্লেষণে অনুযায়ী ১৫ শতক জমিতে কাঁকড়া চাষে নীট মুনাফা পাঁচ বিঘা জমিতে চিংড়ির চাষের মুনাফার প্রায় ৪.৫ গুন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ১৫ শতক জমিতে কাঁকড়া চাষ করতে প্রাথমিকভাবে মাত্র ৫৬,০০০ টাকা প্রয়োজন হয়। এ বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ অপেক্ষা কাঁকড়া চাষ অনেক বেশি লাভজনক। তাছাড়া চিংড়ি ও কাঁকড়ার উৎপাদন খরচ এবং মুনাফার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, আন্তর্জাতিক চাহিদা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং পরিবেশ ও কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব বিশ্লেষণ করলে উদীয়মান কাঁকড়া শিল্পকে বহুলাংশে উন্নয়ন ঘটানোর সঠিক সময় এখনই।

"কাঁকড়া চাষ" সাব সেক্টর উন্নয়নে প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প ও এর প্রভাব

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০০৮ সাল হতে নিজস্ব অর্থায়নে এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (International Fund for Agricultural Development) এর সহায়তায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের বিকাশে ফাইন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (ফেডেক) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র-উদ্যোগ খাতের উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবসা উন্নয়ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান সম্ভাবনাময় উপ-খাতসমূহের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফেডেক প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৩৬টি ভ্যালুচেইন প্রকল্প এবং ০৬ টি ব্যবসা উন্নয়ন সেবা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফেডেক প্রকল্পের আওতায় নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ), সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া, পদ্মপুকুর এবং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নে 'কাঁকড়া চাষ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলীঃ

প্রকল্পের মেয়াদকাল	ঃ	**দুই (২) বছর**
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	০১ মার্চ ২০১১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত
প্রকল্পের উপকারভোগী	ঃ	কাঁকড়া চাষী
প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তার সংখ্যা	ঃ	দুইশত (২০০) জন
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	ঃ	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া, পদ্মপুকুর এবং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়ন
প্রকল্পের মোট বাজেট	ঃ	২১,৬৮,৩০২ টাকা, এর মধ্যে পিকেএসএফ হতে অনুদান ১৫,৬৬,৬০২ টাকা (৭২.২৫%) এবং অবশিষ্ট ২৭.৭৫% এনজিএফ বহন করেছে।

কাঁকড়া চাষের গুরুত্বঃ কাঁকড়া ফ্যাটেনিং বা চাষ একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। উপকূলীয় জলজ প্রাণী বা পণ্যের মধ্যে চিংড়ি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এরপরেই বর্তমানে কাঁকড়া ধীরে ধীরে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিচ্ছে। বাংলাদেশ হতে হিমায়িত খাবার রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে কাঁকড়ার অবস্থান তৃতীয়। বাংলাদেশে ১৯৭৭-৭৮ সালে কাঁকড়া রপ্তানি শুরু হয়ে ধীরে ধীরে এটি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বছরে গড়ে ১,৫০০ মেট্রিক টন কাঁকড়া রপ্তানি করে ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ উপার্জন করে থাকে। পৃথিবীর প্রায় ২৩ টি দেশে কাঁকড়া রপ্তানি হয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চীন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং তাইওয়ান। চীন, জাপান, তাইওয়ান, হংকং এবং সিঙ্গাপুরে গোনাড পরিপূর্ণ স্ত্রী কাঁকড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

অন্যদিকে আমেরিকাতে নরম খোলসের কাঁকড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিভিন্ন কারনে চিংড়ি থেকে আমাদের রপ্তানি আয় যখন ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছে সে মুহুর্তে কাঁকড়া রপ্তানি আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে। কাঁকড়া চাষ করার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, যথাযথ কারিগরী পরামর্শ, প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের বাস্তবভিত্তিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে এ খাত নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থনীতিতে আরো অনেক বেশি অবদান রাখতে সম্ভব হবে। এর ফলে একদিকে যেমন আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে এ সাবসেক্টরে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ

প্রকল্প এলাকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর চিংড়ি চাষের পাশাপাশি কাঁকড়া আহরণ, ফ্যাটেনিং ও বিপণনসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে। চিংড়ি চাষের তুলনায় কাঁকড়া চাষে কম জমি এবং তুলনামূলকভাবে কম পুঁজির প্রয়োজন হলেও কাঁকড়া চাষে মুনাফার হার চিংড়ি চাষের চেয়ে অনেক বেশি বলে কাঁকড়া চাষের এ সাব সেক্টর ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। উল্লেখ্য ১২-১৫ শতক জমিতে কাঁকড়া চাষে অর্জিত মুনাফা ৫ বিঘা জমিতে চিংড়ি চাষে মুনাফার প্রায় ৪.৫ গুন। সুন্দরবন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে চাষ উপযোগী কাঁকড়ার প্রাপ্যতা রয়েছে। বানিজ্যিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ *S. Serrata* প্রজাতির কাঁকড়া মূলত সাগরে জন্ম লাভ করে জোয়ারের পানিতে উপকূলীয় এলাকায় বিস্তার লাভ করে থাকে।

প্রকল্প এলাকায় বানিজ্যিকভাবে চাষ উপযোগী কাঁকড়ার চাষের উপযুক্ত তাপমাত্রা (১২-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং যথাযথ লোনা পানির প্রাপ্যতা (৫-২৫ পিপিটি) রয়েছে। বাঁশ এবং নাইলনের নেট ব্যবহার করে ছোট ঘেরে গ্রেড ফেল কাঁকড়া ২-৪ সপ্তাহ পরিচর্যার মাধ্যমে গোনাড পরিপূর্ণ ও খোলস শক্ত করে বিক্রয় উপযোগী করা হয়।

চীন, জাপান, তাইওয়ান, হংকং এবং সিঙ্গাপুরে গোনাড পরিপূর্ণ স্ত্রী কাঁকড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকাতে নরম খোলসের কাঁকড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কাঁকড়া চাষে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে চাষীরা সনাতন পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষে অভ্যস্ত। ফলে উচ্চ মৃত্যুহার এবং নিম্ন উৎপাদনশীলতার কারণে সম্ভাবনাময় এ খাতটি দ্রুত বিকশিত হতে পারছেনা।

উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ, মৃত্যুহার হ্রাস এবং কার্যকর বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কাঁকড়া চাষের এ সাব সেক্টরকে আরো বিকশিত করতে এ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন এ সেক্টর হতে আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে তেমনি কাঁকড়া চাষীদের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান কাঁকড়া চাষের সুবিধাকে ব্যবহার করে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঁকড়া মোটাজারজাতকরণ, মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস ও উৎপাদন খরচ নূন্যতম পর্যায়ে রেখে কাঁকড়া চাষীদের আয় বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্যঃ সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ-

- আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনায় কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা, কাঁকড়ার উৎপাদন বাড়ানো,
- কাঁকড়া চাষে বিদ্যমান কাঁকড়ার গড় মৃত্যুহার প্রায় ৩৭% হতে ১৫% এর নিচে নামিয়ে আনা,
- টেকসই পাটা/নেট প্রবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা,
- কাঁকড়া চাষে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি করা এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

জেলা ঃ সাতক্ষীরা

উপজেলাঃ শ্যামনগর

ইউনিয়নঃ আটুলিয়া, পদ্মপুকুর, বুড়িগোয়ালিনী

প্রকল্প এলাকার প্রায় ৫ হাজার স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাঁকড়া আহরণ, মোটাতাজাকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে সংযুক্ত। সুন্দরবন সংলগ্ন এ এলাকাতে কাঁকড়ার প্রাপ্যতা যেহেতু সবচেয়ে বেশি সেহেতু এখানকার একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠি সহজাতভাবেই কাঁকড়া আহরণ ও বিপণনে নিয়োজিত।

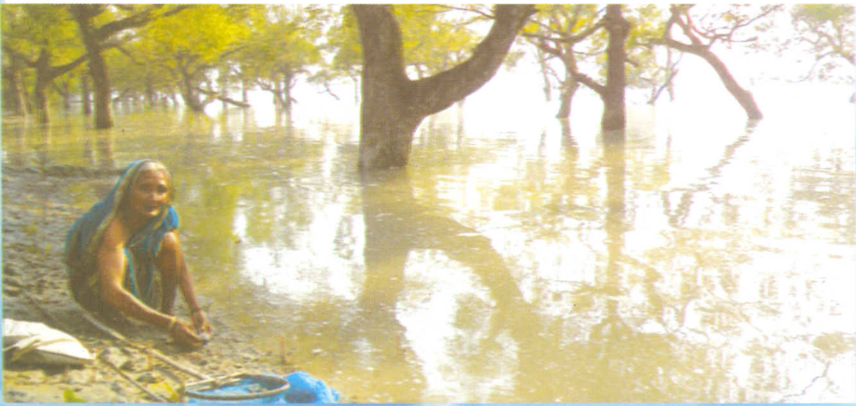

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহঃ

১. *কাঁকড়া চাষে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ* প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক জরিপের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে দুইশ জন চাষীকে “কাঁকড়া চাষ” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্য হতে উৎসাহী, উদ্যোগী এবং তুলনামূলকভাবে বেশী জমিতে কাঁকড়া চাষ করে এমন ২০ জন কাঁকড়া চাষীকে লিডফার্মার নির্বাচন করা হয়। এই ২০০ জন চাষীকে ২০ টি গ্রুপ বা দলে ভাগ করে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা কাঁকড়া চাষের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করে লিড ফার্মারদের এবং অন্যান্য চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণের (ফ্যাটেনিং) গুরুত্ব, কাঁকড়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ, কাঁকড়ার আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, কাঁকড়ার জীবন চক্র, বংশবৃদ্ধির সময়কাল ও বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণের আওতায় কাঁকড়ার মোটাতাজাকরণ, কাঁকড়া চাষ, পুকুর/ঘের প্রস্তুতি, কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণে উপযুক্ত পানি ও মাটি পানির গুনাগুণ নিয়ন্ত্রন যেমন, মাটি ও পানির পি.এইচ মান নিয়ন্ত্রন, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন পরিমাপ, চুন ও সার প্রয়োগ, প্রতি শতাংশে কাঁকড়ার আদর্শ মজুদ হার, খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে চাষীরা জানতে পেরেছে।

প্রশিক্ষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

- কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চাষীদের অবহিত করা;
- কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা;
- কাঁকড়া চাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করা;
- কাঁকড়ার মৃত্যুহার কমানোর কৌশলসমূহ জানানো;
- কাঁকড়া চাষে খরচ কমানোর মাধ্যমে চাষীদের আয় বৃদ্ধি।

২. *উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণঃ* কাঁকড়া চাষে প্রাগ্রসর এলাকা পরিদর্শন এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রকল্প এলাকার কাঁকড়া চাষীদের আরো দক্ষভাবে কাঁকড়া চাষে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ বিবেচনায় প্রকল্পভূক্ত কাঁকড়া চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ হতে অর্জিত জ্ঞানকে আরও টেকসই করার জন্য একটি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের (শিক্ষা সফর) আয়োজন করা হয়। এ উদ্দেশ্যে ২০ জন লিড ফার্মারকে বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার বাগা গ্রামের প্রাগ্রসর কাঁকড়া চাষীদের কাঁকড়া চাষ, হিজড়া কাঁকড়া চাষ এবং কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়।

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য ছিল-

- সাতক্ষীরা জেলা ও বাগেরহাট জেলার কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণ; চাষ পদ্ধতির মধ্যে তুলনা;
- দুই জেলার চাষীদের মধ্যে মুক্ত আলোচনা, পারস্পরিক মতবিনিময়;
- খামার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ;
- হিজড়া কাঁকড়া চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

৩. প্রদর্শনী ঘের স্থাপনঃ আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণের তিনটি এবং কাঁকড়ার খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের টেকসহিতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনটি, মোট ছয়টি পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। মোটাতাজাকরণের তিনটি প্রদর্শনী প্লটে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় কাঁকড়া চাষ কার্যক্রম প্রকল্পভূক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত চাষীদের আদর্শ পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষে উদ্বুদ্ধ করেছে। উপকরণের টেকসহিতা পর্যবেক্ষণের তিনটি পরীক্ষামূলক প্রদর্শণী প্লটের মধ্যে একটিতে প্লাস্টিকের পাটা, একটিতে আলকাতরার আস্তরন বাঁশের পাটা এবং অন্যটিতে রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে বাঁশের পাটা ব্যবহার করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় প্লাষ্টিকের পাটা ব্যবহারে প্রাথমিকভাবে খরচ একটু বেশি হলেও বাঁশের পাটার চেয়ে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি। অন্যদিকে আলকাতরার আস্তরন দিয়ে ব্যবহার করা বাঁশের পাটার স্থায়ীত্ব একটু কম হলেও খরচ চাষীর আওতার মধ্যে থাকে বিধায় বাশেঁর তৈরী পাটা ব্যবহারে চাষীরা বেশি অভ্যস্ত।

৪. হিজড়া কাঁকড়া চাষঃ অপরিপক্ক স্ত্রী কাঁকড়ার মধ্যে যেটির গোনাড ডিমে পরিপূর্ণ হয়না তাদের হিজড়া কাঁকড়া বলে। হিজড়া কাঁকড়া গ্রেড ফেল কাঁকড়া হিসাবে এদের বাজার মূল্য অনেক কম হয়। প্রতি চারটি হিজড়া কাঁকড়ার সাথে একটি পুরুষ কাঁকড়া, এ অনুপাতে নির্দিষ্ট নিয়মে ২০-৪০ দিন লালন-পালন করলে একবার খোলস পরিবর্তন করে এগুলো প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী কাঁকড়ায় রুপান্তরিত হয় এবং এদের গোনাড ডিমে পরিপূর্ণ হয়ে গ্রেড কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হয়। হিজড়া কাঁকড়া চাষে মোটাতাজাকরণের চেয়ে বেশি সময় লাগলেও এটি মোটাতাজাকরণের চেয়ে বেশী লাভজনক, কারণ মোটাতাজাকরণের সময় পুরুষ কাঁকড়ার কোন ওজন বৃদ্ধি ঘটেনা শুধুমাত্র নরম খোলস পরিবর্তিত হয়ে শক্ত হয়। তবে স্ত্রী কাঁকড়ার ক্ষেত্রে গোনাডের ওজন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হিজড়া কাঁকড়া খোলস পরিবর্তন করার সময় তার শরীরের ওজন প্রায় ৮৫- ৯০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং গোনাড পরিপূর্ণ হয়ে আবার গোনাডের ওজন বৃদ্ধি পায়। হিজড়া কাঁকড়ার ক্রয় মূল্য অনেক কম। খোলস পরিবর্তন করে হিজড়া কাঁকড়া স্ত্রী কাঁকড়ায় পরিনত হয় এবং ওজন প্রায় দ্বিগুন হয় তাই এটি চাষ মোটাতাজাকরণের চেয়ে বেশি লাভজনক। এ ব্যাপারে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে দুটি হিজড়া কাঁকড়ার প্রদর্শণী প্লট করা হয়।

চিত্রে বাম দিক থেকে যথাক্রমে পুরুষ, মেয়ে ও হিজড়া কাঁকড়া

৫. তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও তথ্য প্রদানঃ

কাঁকড়া চাষ ব্যবস্থাকে আরও বেশি পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক করতে কাঁকড়া চাষের বিভিন্ন কারিগরী দিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় তুলে ধরে প্রশিক্ষণ এবং কর্মশালার বিভিন্ন ছবি সম্বলিত লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে। কাঁকড়া চাষের উপর সম্পাদিত লিফলেট হতে চাষীরা কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে জানতে পারছে। এছাড়াও প্রকল্প কার্যালয়ে কাঁকড়া চাষ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

এ তথ্য কেন্দ্র হতে চাষীরা বিনামূল্যে তাদের ঘেরের মাটি ও পানি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়েছে। এছাড়াও তথ্য কেন্দ্র হতে চাষীরা বিভিন্ন ডিপোতে কাঁকড়ার প্রাত্যহিক দাম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত হতে পারছে।

চিত্রে মাটি ও পানির গুনাগুণ পরিমাপক যন্ত্রাদি

৬. বাজার সংযোগ স্থাপনঃ আমাদের দেশে খাদ্য তালিকায় কাঁকড়া এখনো ব্যাপকভাবে স্থান করে না নিলেও খাদ্য হিসেবে বহির্বিশ্বে জলজ এ সম্পদটির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যথাযথ মার্কেট লিংকেজ স্থাপন করা গেলে কাঁকড়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। কাঁকড়া মূলত রপ্তানি নির্ভর হওয়ায় কাঁকড়ার মার্কেট চেইনে রপ্তানিকারকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ডিপো মালিকরাই মূলত স্থানীয়ভাবে কাঁকড়ার দাম নির্ধারণ করে থাকে। কিছু চাষী ফড়িয়ার কাছে বা বড় ডিপোগুলোতে কাঁকড়া বিক্রি করে থাকলেও বেশিরভাগ কাকড়া চাষীই স্থানীয় ডিপোতে তাদের কাঁকড়া বিক্রি করে। রপ্তানিকারকদের সাথে স্থানীয় ডিপোগুলোর যোগাযোগ নেই বরং তারা কিছু বড় ডিপো বা এজেন্টের মাধ্যমে রপ্তানির জন্য কাঁকড়া সংগ্রহ করে। চাষীদের সাথে বড় ডিপো মালিক বা রপ্তানিকারকদের সরাসরি সংযোগের অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চাষীরা ন্যায্য মূল্য পেতনা।

প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও লক্ষ্য ছিল চাষীরা যাতে তাদের কাঁকড়া চাষ হতে অধিক লাভবান হতে পারে এজন্য বাজার সংযোগ স্থাপন করা। বাজার সংযোগ কর্মশালার মাধ্যমে চাষীদেরকে কাঁকড়া শিল্পে বিদ্যমান কাঁকড়ার বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এর আওতায় কাঁকড়া চাষীদের সাথে স্থানীয় ডিপো মালিক এবং বড় ডিপো মালিকদের সাথে সংযোগ স্থাপন হয়েছে। এর ফলে কাঁকড়া চাষীরা পূর্বের তুলনায় বেশি দামে তাদের উৎপাদিত কাঁকড়া বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছেন।

৭. রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথমদিকে কাঁকড়া চাষীদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের শিক্ষণসমূহ যাতে মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রকল্পের শেষ দিকে রিফ্রের্সাস প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদত্ত বিভিন্ন কারিগরী বিষয় এবং তথ্য পুনঃউপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের শিক্ষণসমূহ দীর্ঘমেয়াদী করা হয়। রিফ্রের্সাস প্রশিক্ষণটি প্রথমে ২০ জন দলনেতা চাষীদের দেওয়া হয় যাতে তারা এই জ্ঞানকে নিজেদের দলের অন্য চাষীদের জানাতে পারে এবং পরবর্তীতে পুনরায় ১৮০ জন চাষীকে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তাদের চাষ ও মোটাতাজাকরণ বিষয়ে কোন তথ্যের ঘাটতি না থাকে।

৮. লিড চাষীদের মাসিক সভাঃ যে কোন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চাষী ভিন্ন ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কাঁকড়া মোটাতাজাকরনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুফল ও বাঁধাসমূহ এবং এ সকল সমস্যা মোকাবেলার পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত চাষীরা অনেক বেশী লাভবান হতে পারে। তাই প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া মোটাতাজাকরনকারী বা চাষীদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যে এ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রকল্পে ২২টি মাসিক সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৮টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯. ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভাঃ কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে কাঁকড়া চাষীরা প্রশিক্ষণলব্ধ প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান যাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ বা চাষের ক্ষেত্রে নানান বিষয়ে নিয়মিতভাবে তাদেরকে হালনাগাদ তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্যে প্রকল্পে ০৮টি ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠানের বিপরীতে ২০টি ইস্যুভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০. সার্বক্ষণিক কারিগরী পরামর্শ সেবা প্রদানঃ প্রকল্পের আওতায় এক জন টেকনিক্যাল এবং একজন সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার নিয়মিত চাষীদের কাঁকড়া চাষের ঘেরসমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ সেবা প্রদান করেন। প্রকল্প কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকির ফলে চাষীরা কাঁকড়া চাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতা হতে রক্ষা পেয়ে লাভজনকভাবে কাঁকড়া চাষে সমর্থ হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সব কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে পিকেএসএফ এর নিদের্শনা ও সংস্থার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কার্যকর মনিটরিং এবং অব্যাহত পরামর্শ সেবা প্রদানের ফলে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক বেশি সফলতা অর্জিত হয়েছে।

"কাঁকড়ার চাষ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব

দুই বছর ব্যাপী "কাঁকড়ার চাষ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রাক-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব হিসাবে কাঁকড়া মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা ও মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্পের ইন্টারভেনশনের ফলে কাঁকড়ার ঘের ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমান বেড়েছে। মৃত্যুহার হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সকল কর্মকান্ডেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের দুই ধরণের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে- আচরণগত প্রভাব ও অর্থনৈতিক প্রভাব।

আচরণগত প্রভাব বিশ্লেষণ

কাঁকড়া মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনাঃ

১. কাঁকড়া চাষের ঘের তৈরিঃ আদর্শ পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষের জন্য সাধারনত বছরের শুরুতেই একবার ঘেরের কাদা মাটি তুলে পাড়ে রাখতে হয়। কর্দমাক্ত এলাকায় পানির প্রবাহ ও মানুষের যাতায়াতের ফলে পাড় সহজে নষ্ট হয়ে যায়। প্রাক-মূল্যায়ন জরিপ হতে পাওয়া যায় যে ১৩ ভাগ চাষী অনিয়মিত পাড় মেরামত করলেও ৮৭ ভাগ চাষী পাড় মেরামত করতো না। কিন্তু চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ হতে দেখা যায় বর্তমানে শতভাগ চাষীই পুকুরের পাড় যথাযথভাবে মেরামত করেন এবং বর্ষাকালে পাড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় মেরামত করেন।

বিবরণ	পুকুরের পাড় তৈরি/মেরামত নিয়মিত ও পরিমিত (%)	পুকুরের পাড় তৈরি/মেরামত অনিয়মিত (%)	পুকুরের পাড় তৈরি/মেরামত করেন না (%)	মোট (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	০	১৩	৮৭	১০০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	১০০	০	০	১০০

পূর্বের অবস্থা

বর্তমান অবস্থা

২. ঘের শুকানোঃ প্রাক-জরিপ অনুযায়ী নির্বাচিত ২০০ জন চাষীর ১৩% তাদের ঘের নিয়মিত রোদে শুকাতো, ৪% চাষী দুই বছরে একবার ঘের শুকাতো, মোটেও পুকুর শুকাতোনা এমন চাষীর সংখ্যা ৮৩%। তবে এদের মধ্যে অনেকেই ঘেরের তলা না শুকিয়ে পুরো পানি পরিবর্তন করে ফেলতো। কিন্তু চুড়ান্ত মূল্যায়নে দেখা যায় ৯৩% চাষী পুকুর নিয়মিত শুকান, ৭% চাষী অনিয়মিতভাবে (বছরে দুই একবার) পুকুর শুকান।

বিবরণ	ঘের শুকানো নিয়মিত (%)	ঘের শুকানো অনিয়মিত (%)	ঘের শুকায়না (%)	মোট (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	১৩	৪	৮৩	১০০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	৯৩	৭	০	১০০

৩. ঘের প্রস্তুতিতে চুন প্রয়োগ ঃ কাঁকড়া মজুদ পূর্ববতী ব্যবস্থাপনা হিসাবে কাঁকড়া চাষের ঘের প্রস্তুতির সময় প্রতি শতকে ১.০-১.৫ কেজি চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিবার কাঁকড়া মজুদ করার সময় শতক প্রতি ২৫০-৩০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হয়। প্রাক-মুল্যায়ন জরীপে দেখা যায় যে, ২৬% চাষী তাদের ঘেরে কাঁকড়া মজুদ পূর্ববর্তী ব্যবস্থা হিসেবে নিয়মিত চুন প্রয়োগ করে থাকলেও ১৭% চাষী অনিয়মিতভাবে চুন প্রয়োগ করতো। নিয়মিত চুন প্রয়োগকারী চাষীরা মাটির বৈশিষ্ট্য (অম্লিত্ব বা ক্ষারত্ব) না জেনে শতক প্রতি ৫০০ গ্রাম থেকে ১,০০০ গ্রাম চুন একবারেই প্রয়োগ করতো। ৫৮% ভাগ চাষী পুকুর/ঘের প্রস্তুতির সময় কোন চুন প্রয়োগ করত না। বর্তমানে শতভাগ কাঁকড়া চাষীই কাঁকড়া চাষের ঘের প্রস্তুতির সময় পরিমিত মাত্রায় চুন প্রয়োগ করে।

বিবরণ	চুন প্রয়োগ নিয়মিত ও পরিমিত (%)	চুন প্রয়োগ অনিয়মিত (%)	চুন প্রয়োগ করেন না (%)	মোট (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	২৬	১৭	৫৭	১০০
চুড়ান্ত মূল্যায়ন	১০০	০	০	১০০

৪. আশ্রয় স্থল তৈরি ঃ কাঁকড়া খোলস ছাড়ার সময় এদের দেহ খুব দুর্বল ও নরম থাকে বলে গাছের ডাল, বাঁশের কঞ্চি, পিভিসি পাইপ, প্লাস্টিকের ভাঙ্গা পাত্র দিয়ে আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করতে হয় যাতে একে অপরকে খেয়ে ফেলতে না পারে। মোটাতাজাকরণের সময় আশ্রয়স্থল তৈরির প্রয়োজন নেই। তবে হিজড়া কাঁকড়া বা ছোট কাঁকড়া চাষের সময় আশ্রয় স্থল তৈরি আবশ্যক। প্রাক মূল্যায়নে দেখা যায় প্রকল্প এলাকার চাষীরা কাঁকড়ার খোলস পাল্টানোর জন্য কোন আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করতো না। তবে চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ অনুযায়ী নির্বাচিত ২০০ জন চাষীর মধ্যে ৪৫ জন চাষী হিজড়া কাঁকড়া চাষ করে এবং তারা আশ্রয়স্থল তৈরি করে।

বিবরণ	আশ্রয়স্থল তৈরি নিয়মিত ও পরিমিত (জন)	আশ্রয়স্থল তৈরি অনিয়মিত (জন)
প্রাক-মূল্যায়ন	১	০
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৪৫	৩

৫. কাঁকড়া মজুদকরণঃ কাঁকড়া চাষের জন্য আদর্শ হল প্রতি শতক কাঁকড়া চাষের পয়েন্টে ৮৫-৯০ টি কঁকড়া মজুদ করা। তারা কেজি হিসেবে ডিপো থেকে পিডি (পোষ্ট ডিমোল্টিং) ও খোসা কাঁকড়া নিয়ে কাঁকড়া চাষের ঘেরে মজুদ করে। প্রাক মূল্যায়ন জরিপ অধিক পরিমান কাঁকড়া মজুদে উদ্ভুত সমস্যার ফলে কাঁকড়ার মৃত্যুহার বেশি ছিল। প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ অনুযায়ী তারা এখন প্রতি শতকে গড়ে ৮৫ টি কাঁকড়া মজুদ করে। এর ফলে মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে এবং কাঁকড়ার আকার এবং ওজনের যথাযথ বৃদ্ধি ঘটছে।

একনজরে কাঁকড়া মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য ঃ

বিবরণ	নিয়মিত ও পরিমিত (%)		অনিয়মিত (%)		করেন না (%)		মোট (%)
	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	
কাঁকড়ার ঘের রোদে শুকানো	১২.৫	৯৬	৩.৫	৪	৮৪	০	১০০
পাড় মেরামত	০	১০০	১৩	০	৮৭	০	১০০
চুন প্রয়োগ	২৫.৫	১০০	১৭	০	৫৭.৫	০	১০০
সার প্রয়োগ	০	৮৫	০	১৩	১০০	২	১০০
আশ্রয় স্থল তৈরি	০১	৪৫	০	৩	১৯৯	১৫২	১০০

কাঁকড়া মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনাঃ

প্রকল্পের ইন্টারভেনশনের ফলে কাঁকড়া মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রশিক্ষণের শিক্ষণ অনুযায়ী কাঁকড়া চাষীরা মজুদ পরবর্তী বিভিন্ন ব্যবস্থাপনায় আদর্শ পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

১. খাদ্য প্রয়োগঃ কাঁকড়া চাষের জন্য আদর্শ হল প্রতি দশ কেজি কাঁকড়ার জন্য ৮০০-১,০০০ গ্রাম খাবার দিনে দুই বার প্রদান করা। কাঁকড়া চাষীরা স্থানীয় বাজার থেকে কম মূল্যের মাছ যেমন তেলাপিয়া, কুচে, ছোট চিংড়ি বা চিংড়ির মাথা, ছাগল ও গরুর নাড়িভুঁড়ি সংগ্রহ করে কাঁকড়ার খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। পূর্বে সারাদিনে একবার (কখনও দুইবার) খাবার দেওয়া হতো এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোন হিসাব না রেখে ইচ্ছেমত খাবার দেওয়া হত আবার কখনও কখনও কয়েকদিন খাবার দেওয়া হতোনা। প্রাথমিক জরিপের ফল হতে জানা যায় যে, ২০০ জন চাষীর ১৬.৫% নিয়মিত, ৭৯% অনিয়মিতভাবে খাবার দিত এবং ৪.৫ শতাংশ চাষী খাবার প্রদান করতোনা। চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ হতে পাওয়া যায় ৯৭ শতাংশ চাষী নিয়মিত এবং তিন শতাংশ চাষী অনিয়মিত খাদ্য প্রদান করেন।

বিবরণ	খাদ্য প্রদান নিয়মিত ও পরিমিত (%)	খাদ্য প্রদান অনিয়মিত (%)	খাদ্য প্রদান করেন না (%)	মোট (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	১৬.৫	৭৯	৪.৫	১০০
চূড়ান্ত-মূল্যায়ন	৯৭	৩	০	১০০

২. পানি পরিবর্তনঃ কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের জন্য নিয়মিত পানি পরিবর্তন অপরিহার্য। নিয়মিত পানি পরিবর্তন ফলে কাঁকড়াসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী বিভিন্ন ভাইরাস এবং ছত্রাক জনিত বিভিন্ন রোগবালাই হতে রক্ষা পায়। প্রাকমূল্যায়ন জরিপ হতে দেখা যায়, প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত চাষীদের ১৭.৫ শতাংশ চাষী কাঁকড়া মজুদ পরবর্তী সময়ে নিয়মিত পানি পরিবর্তন করত, ৫.৫ শতাংশ অনিয়মিতভাবে পানি পরিবর্তন করত এবং ৭৭ শতাংশ চাষী পানি পরিবর্তন করতোনা। তবে চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ হতে দেখা যায় ৯৬ শতাংশ চাষী নিয়মিত পানি পরিবর্তন করেন এবং ৪ শতাংশ চাষী অনিয়মিতভাবে পানি পরিবর্তন করেন। নিয়মিত পানি পরিবর্তনকারী চাষীদের সবার কাঁকড়া চাষের ঘেরে জোয়ারের সময় পানি প্রবেশ করার ও ভাটার সময় পানি সরে যাওয়ার ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু আছে।

বিবরণ	পানি পরিবর্তন (নিয়মিত ও পরিমিত) (%)	পানি পরিবর্তন অনিয়মিত (%)	পানি পরিবর্তন করেন না (%)	মোট (%)
প্রাক-মূল্যায়ন	১৭.৫	৫.৫	৭৭	১০০
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	৯৬	৪	০	১০০

৩. চুন-সার প্রয়োগঃ সার প্রয়োগের ফলে পানিতে অক্সিজেন উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ শ্যাওলা তৈরি হয় যা কাঁকড়ার জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে। প্রাক মূল্যায়ন জরিপ হতে দেখা যায় কাঁকড়া মজুদের পর চাষীরা কোন প্রকার চুন বা সার প্রয়োগ করতোনা। তবে বর্তমানে শতভাগ চাষী পোনা মজুদ পরবর্তী কাঁকড়া চাষের ঘেরে নিয়মিত চুন ও সার প্রয়োগ করে।

বিবরণ	নিয়মিত ও পরিমিত (%)		অনিয়মিত (%)		করেন না (%)		মোট (%)
	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	
চুন প্রয়োগ	০	১০০	০	০	১০০	০	১০০
সার প্রয়োগ	০	১০০		০	১০০	০	১০০

৪. কাঁকড়ার স্বাস্থ্য, মাটি ও পানি পরীক্ষাঃ কাঁকড়া চাষের জন্য মাটির pH ৬-৭.৫ এবং পানির pH ৭-৮.৫ হওয়া বাঞ্চনীয়। প্রাক-মূল্যায়ন হতে দেখা যায় প্রকল্প এলাকার কাঁকড়া চাষীরা আগে কাঁকড়া চাষের ঘের প্রস্তুতির জন্য মাটি এবং পানি পরীক্ষা করতো না। উপজেলা মৎস্য অফিসে মাটি-পানি পরীক্ষা করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি থাকলেও তা ব্যবহারের সুবিধা চাষীরা পেতনা। প্রকল্পের আওতায় একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যেখানে কাঁকড়া চাষ এবং বিক্রয় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও এ তথ্য কেন্দ্রে বিনা খরচে ঘেরের মাটি ও পানি পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় এ তথ্য কেন্দ্রে এসে চাষীরা নিয়মিত মাটি ও পানি পরীক্ষা করছেন। কাঁকড়ার বৃদ্ধি ফলোআপ করতে চাষীরা বর্তমানে নিয়মিত কাঁকড়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন।

বিবরণ	নিয়মিত (%)		অনিয়মিত (%)		করেন না (%)		মোট (%)
	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	
কাঁকড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা	০	১০০	০	০	১০০	০	১০০
মাটি ও পানি পরীক্ষা	০	১০০	০	০	১০০	০	১০০

একনজরে কাঁকড়া মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্যঃ

বিবরণ	নিয়মিত ও পরিমিত (%)		অনিয়মিত (%)		করেন না (%)		মোট (%)
	প্রাক-মূল্যায়ন	চুড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চুড়ান্ত মূল্যায়ন	প্রাক-মূল্যায়ন	চুড়ান্ত মূল্যায়ন	
পানি পরিবর্তন	১৭.৫	৯৬	৫.৫	৪	৭৭	০	১০০
চুন প্রয়োগ	০	১০০	০	০	১০০	০	১০০
সার প্রয়োগ	০	১০০	০	০	১০০	০	১০০
খাদ্য প্রয়োগ	১৬.৫	৯৭	৭৯	৩	৪.৫	০	১০০
কাঁকড়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা	০	১০০	০	০	১০০	০	১০০
মাটি ও পানি পরীক্ষা	০	১০০	০		১০০	০	১০০

অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ

১. চাষকৃত জমির পরিমানঃ প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন জরিপ অনুযায়ী প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত ২০০ জন চাষীর কাঁকড়া চাষের/ মোটাতাজাকরণের আওতায় মোট জমির পরিমান ছিল ২,৭১১ শতক। অর্থাৎ চাষী প্রতি গড় জমির পরিমান ছিল ১৩.৫৬ শতক। প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরণের কারিগরী সহায়তা প্রদানের ফলে বর্তমানে জমির পরিমান দাড়িয়েছে ৩,৪০২ শতক। অর্থাৎ চুড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জরিপ অনুযায়ী গড় জমির পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৭.০১ শতক। চিত্রে বিভিন্ন আয়তনের খামারের প্রকল্প গ্রহণের পূর্বের এবং পরের কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ঘেরের সংখ্যার তুলনা দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের দুই বছরে উদ্যোক্তাদের কাঁকড়া চাষে বা মোটাতাজাকরণে জমির পরিমান ২৫.৪৯ % বৃদ্ধি পেয়েছে।

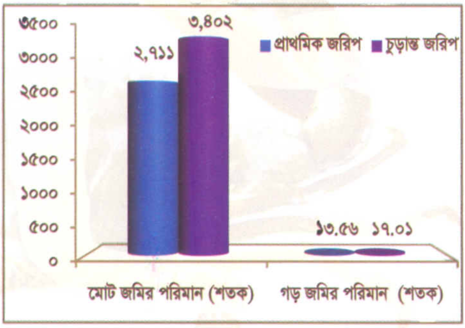

২. উৎপাদনঃ 'কাঁকড়া চাষ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের প্রধান অর্জন হলো কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রাক-মূল্যায়ন ও চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ এর ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রাক-মূল্যায়ন অনুযায়ী প্রতি সার্কেলে শতাংশ প্রতি কাঁকড়ার উৎপাদন ছিল ৩.৮০ কেজি কিন্তু বর্তমানে প্রতি শতাংশে ৫.২৬ কেজি কাঁকড়া উৎপাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ শতাংশ প্রতি গড় উৎপাদনশীলতা ৩৯.৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প শুরুতে প্রাক-মূল্যায়ন অনুযায়ী ২০০ জন চাষীর প্রতি সার্কেলে মোট উৎপাদন ছিল ১০,৩০০ কেজি এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,৮৯৩ কেজিতে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ৭৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল কাঁকড়া মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাওয়া,কাঁকড়া চাষে উন্নত প্রযুক্তির

ব্যবহার এবং কাঁকড়া চাষের আওতায় জমির পরিমানের বৃদ্ধি। উল্লেখ্য উপরোক্ত হিসাব নিকাশ এক সাইকেল কাঁকড়া মোটাতাজাকরণের জন্য প্রযোজ্য। বছরে কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে এরকম সর্বোচ্চ ২০টি সাইকেল পরিচালনা করা সম্ভব।

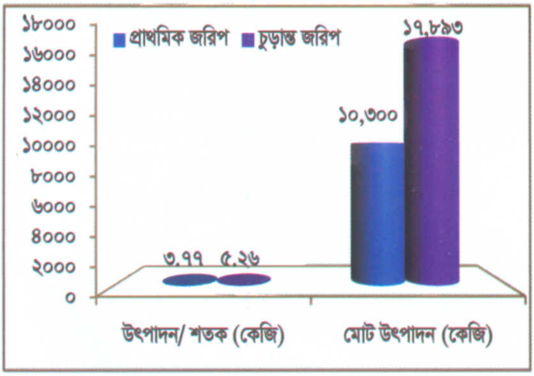

৩. *কাঁকড়ার মৃত্যুহার হ্রাসঃ* কাঁকড়া চাষ বা মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরী সহায়তা প্রদান, কাঁকড়ার মজুদের হার নিয়ন্ত্রন, মাটি ও পানি পরীক্ষার সহায়তা প্রদান, অব্যাহত পরামর্শ সেবা প্রদানের ফলে কাঁকড়ার মৃত্যুহার প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশী হ্রাস পেয়েছে। কাঁকড়ার মৃত্যুহার প্রাক মূল্যায়ন জরিপে ছিল ৩৩-৩৫%। প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কাঁকড়ার মৃত্যুহার ১৫% এর নিচে নামিয়ে আনা। কিন্তু চূড়ান্ত মূল্যায়নে এসে মৃত্যুহার দাঁড়িয়েছে ৫-৭%। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় মৃত্যুহার প্রায় ২৮% হ্রাস পেয়েছে।

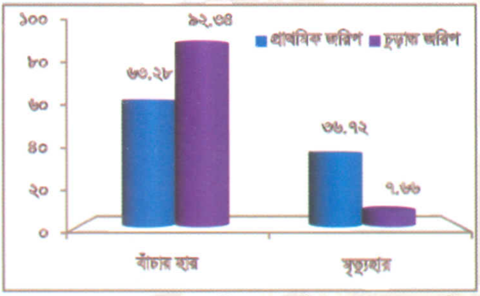

৪. *উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগঃ* কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে চাষীদের মোট বিনিয়োগ ৬৩.২৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রভাব স্বরূপ ২০০ জন চাষীর ১৫ দিনের এক দফার মোট বিনিয়োগ ৩৪,৩৪,৫৯৩ টাকা হতে বেড়ে ৫৬,০৭,৭৪০ টাকা হয়েছে। চাষী প্রতি ১৫ দিনের এক দফার গড় বিনিয়োগ ১৭,১৭৩ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮,০৩৮ টাকা হয়েছে। শতাংশ প্রতি গড় মুনাফা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য এই বিনিয়োগ কেবলমাত্র এক সাইকেলের (১৫-১৭ দিনের) জন্য প্রযোজ্য।

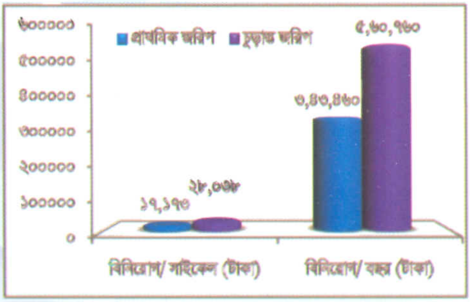

৫. উৎপাদন খরচঃ শতাংশ প্রতি গড় উৎপাদন খরচ ১,২৯৩ টাকা থেকে বেড়ে ১,৬৪৮ টাকা হয়েছে। এর বিপরীতে শতক প্রতি উৎপাদন বেড়ে ৩.৭৭ কেজি হতে ৫.২৬ কেজি হয়েছে। বর্তমানে কাঁকড়ার কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ ৩১৪ টাকা যা প্রাথমিক মূল্যায়ন জরিপ অনুযায়ী ছিল ৩৪৩ টাকা। অর্থাৎ কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ প্রায় ৯.৫% কমেছে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের সকল দ্রব্যের সঙ্গে কাঁকড়া চাষের কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হ্রাস করা সম্ভব হয়নি, তবে আয় ও ব্যয়ের আনুপাতিক দৃষ্টিতে খরচ নিম্নমূখী।

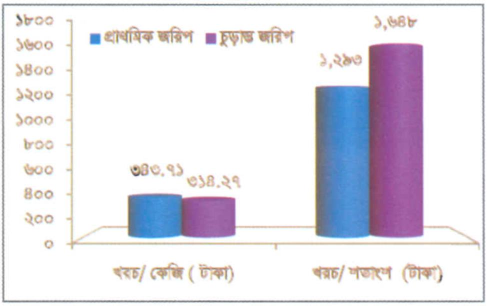

৬. লাভঃ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়া, আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা বৃদ্ধি এবং একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে চাষীদের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে শতক প্রতি কাঁকড়ার উৎপাদন খরচ ছিল ১,২৯৩ টাকা যা বর্তমানে ১,৬৪৮ টাকা। পূর্বে শতক প্রতি কাঁকড়ার উৎপাদন ছিল ৩.৭৭ কেজি যা বর্তমানে হয়েছে ৫.২৬ কেজি। পূর্বে প্রতি কেজি কাঁকড়ার গড় বিক্রয় মূল্য ছিল ৪৩৪ টাকা যা বর্তমানে হয়েছে ৫০৫ টাকা। পূর্বে কেজি প্রতি কাঁকড়া উৎপাদনে লাভ ছিল ৯১.৪৪ টাকা যা বর্তমানে বেড়ে দাড়িয়েছে ১৯২.০৭ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্প শুরুর সময়ের তুলনায় বর্তমানে কাঁকড়া চাষে প্রতি কেজিতে লাভ ১১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাঁকড়া রপ্তানিকারকদের সাথে চাষীদের কার্যকর বাজার সংযোগ স্থাপনের ফলে কেজি প্রতি লাভের এই বৃদ্ধি ঘটেছে। বিনিয়োগ থেকে আয় (ROI) পূর্বে ছিল ৫৩৩.১৭ শতাংশ যা বর্তমানে ১,২২৬.০৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রকল্পের ইন্টারভেনশনের ফলে বিনিয়োগ থেকে আয় (ROI) প্রায় ৬৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

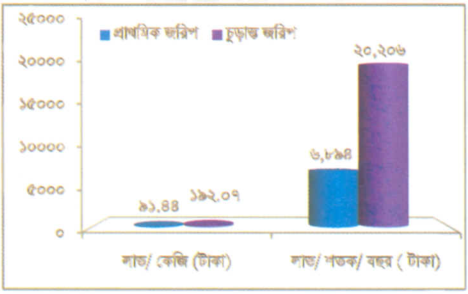

৭. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল। প্রকল্প শুরতে প্রাক-মূল্যায়ন অনুযায়ী ২০০ জন চাষীর খামারে মোট ৫১৩ জন লোক কাঁকড়া মোটাতাজাকরণে নিয়োজিত ছিল। চুড়ান্ত মূল্যায়ন জরিপ অনুযায়ী ২০০ জন চাষীর খামারে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ৬৩০ জন। অর্থাৎ প্রকল্পের ইন্টারভেনশনের ফলে প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্প এলাকায় ২০০ জন চাষীর খামারে ২৩% অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

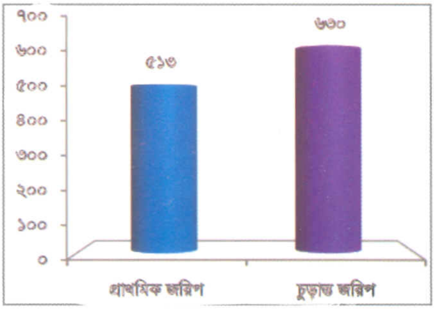

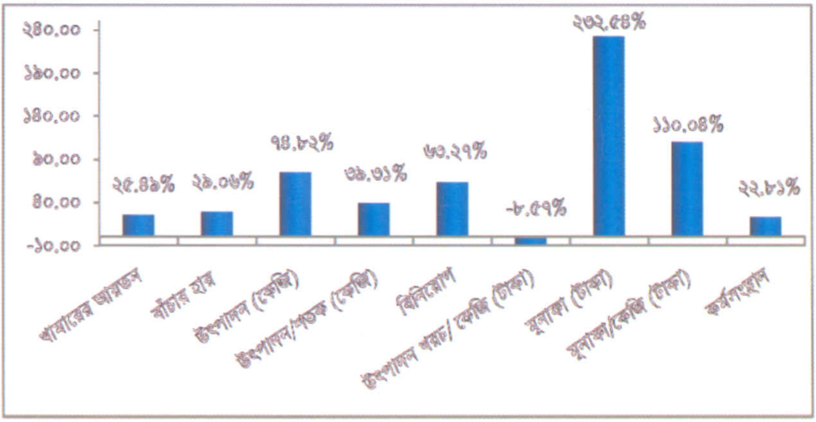

চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

১. কাঁকড়া চাষ কার্যক্রমে পোনা কাঁকড়া সংগ্রহের উৎস হিসাবে চাষীরা এখনো প্রাকৃতিক উৎসের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশে কোন হ্যাচারী স্থাপিত না হওয়ায় পর্যাপ্ত সংখ্যক পোনা প্রাপ্তি ভবিষ্যতে দ্রুত সম্প্রসারণশীল এই সাব সেক্টরের বিকাশে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিতে পারে।

২. কাঁকড়ার খাদ্য হিসাবে কুঁচে, তেলাপিয়া সহ অন্যান্য ছোট মাছ ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ কাঁকড়ার খাদ্যের জন্য চাষীরা প্রাকৃতিক উৎসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল রয়ে গেছে। এই নির্ভরশীলতা কাটিয়ে বানিজ্যিক খাবার উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করা না গেলে এই সাব সেক্টরের বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে।

সুপারিশঃ প্রকল্প এলাকার পাশাপাশি বাংলাদেশে খুলনা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কক্সবাজারে কাঁকড়া চাষের ব্যবসাগুচ্ছ গড়ে উঠেছে। এসব এলাকার কাঁকড়া চাষীদেরকে অনুরূপ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক পদ্ধতিতে কাঁকড়া চাষে অভ্যস্ত করানো সম্ভব হলে দেশে কাঁকড়া চাষের উপখাত দ্রুত বিকশিত হতে পারে। এর ফলে কাঁকড়ার উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধি পাবে এবং এ খাত হতে রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটবে।

কাঁকড়া চাষ এবং ইউনূস আলীর সাফল্যের ইতিকথা

পৃথিবীতে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো মানুষের সংখ্যা খুবই কম। বেঁচে থাকার তাগিদে কম বেশী সবাইকে সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম যেন শেষ হবার নয়, তাদের এই সংগ্রাম চলতে থাকে মূলত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। আর এই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে কিছু মানুষ প্রতি নিয়ত নতুন পথের সন্ধান করতে থাকে যা অন্যদের কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। তেমনি একজন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের তাতিনাখালী গ্রামের ইউনূস আলী। সময়ের প্রয়োজনে জীবিকার তাগিদে একজন সফল কাঁকড়া চাষী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন ইউনূস। আর এই সফলতা এসেছে কঠোর পরিশ্রম এবং ব্যতিক্রমধর্মী কিছু করার প্রত্যয় থেকে।

বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ভাগ্যাহত মানুষের মতই ইউনূস আলী অল্প বয়সেই অবতীর্ণ হন জীবিকা অর্জনের কঠিম সংগ্রামে। মা-বাবা, ভাই-বোন মিলে আট জনের অভাবের সংসারে সবার ভরণ-পোষণ যোগানো দিনমজুর ইউনূস আলীর পক্ষে একপ্রকার দুঃসাধ্যই হয়ে পড়েছিল। তারপরেও বহমান সময়ের আবর্তে খেয়ে না খেয়ে দিনগুলো কাটছিল তাদের। নব্বই দশকের শুরুর দিকে এ অঞ্চলে কাঁকড়া চাষের প্রচলন ঘটে। অনেক ভেবেচিন্তে ও সাহস সঞ্চয় করে ইউনূস আলী ১৯৯৮ সালে প্রথমে পাঁচ শতক জায়গা লীজ নিয়ে কাঁকড়ার মোটাতাজাকরন শুরু করেন। এলাকার অন্যদের মত কাঁকড়া চাষের বিভিন্ন কারিগরী দিক এবং যথাযথ প্রযুক্তি না জানার ফলে কাঁকড়ার মৃত্যুহার অনেক বেশি ছিল। এছাড়া কার্যকর বাজার সংযোগের অভাবে উৎপাদিত কাঁকড়ার ন্যায্য মূল্য হতেও বঞ্চিত হচ্ছিল ইউনূস এবং অন্যরা। কাঁকড়া চাষ ইউনূসের নিকট একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত হলেও উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতার কারণে কাঙ্খিত মুনাফা হতে বঞ্চিত হচ্ছিল।

২০১১ সালে নওয়াবেকী গনমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সম্ভাবনাময় এ সাব সেক্টরের উন্নয়নে কাঁকড়া চাষ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাঁকড়া চাষে চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কাঁকড়া চাষের এ সাব-সেক্টরের বিকাশ এবং চাষীদের আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত এ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষন ও অন্যান্য কারিগরী সহায়তা পান ইউনূস আলী। এর ফলে সনাতন পদ্ধতির বদলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ঘের নির্মাণ, পাড় মেরামত, সময়মত পানি পরিবর্তনের পাশাপাশি অভ্যস্থ হয়েছেন মাটি ও পানি পরীক্ষার মাধ্যমে চুন ও সার প্রয়োগে। এসব শিক্ষণ এবং প্রকল্পের আওতায় অব্যাহত কারিগরী পরামর্শ সেবার প্রাপ্তির ফলে ইউনূস আলী কাঁকড়ার পূর্বের মৃত্যুহার ৪০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া আধুনিক ব্যবস্থাপনা মেনে কাঁকড়া চাষের ফলে উৎপাদন খরচও কমেছে অনেকাংশে। নিজের অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম এবং যথাযথ কারিগরী জ্ঞানের সমন্বয় ইউনূস আলীর জীবনে সাফল্যের সূর্যোদয় ঘটিয়েছে। এই সাফল্যের সুবাতাসই এখন তার নিত্যসঙ্গী।

বর্তমানে ইউনূস আলী গড়ে ৬০ শতক জায়গার প্রশিক্ষণের শিক্ষন অনুযায়ী কাঁকড়া চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। দুই হতে তিন সপ্তাহ ব্যাপী প্রতি সাইকেল কাঁকড়া চাষে গত বছর তার বিনিয়োগের পরিমান ছিল ২,০০,০০০ টাকা। ২০১১-১২ সালে গৃহীত এ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কারিগরী সহায়তা পান ইউনূস আলী। এর ফলে সনাতন পদ্ধতির বদলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ঘের নির্মাণ, পাড় মেরামত, সময়মত পানি পরিবর্তনের পাশাপাশি অভ্যস্ত হয়েছেন মাটি ও পানি পরীক্ষার মাধ্যমে চুন ও সার প্রয়োগে। এসব শিক্ষণ এবং প্রকল্পের আওতায় অব্যাহত কারিগরী পরামর্শ সেবার প্রাপ্তির ফলে ইউনূস আলী কাঁকড়ার পূর্বের মৃত্যুহার ৪০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া আধুনিক ব্যবস্থাপনা মেনে কাঁকড়া চাষের ফলে উৎপাদন খরচও কমেছে অনেকাংশে। নিজের অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম এবং যথাযথ কারিগরী জ্ঞানের সমন্বয় ইউনূস আলীর জীবনে সাফল্যের সূর্যোদয় ঘটিয়েছে। এই সাফল্যের সুবাতাসই এখন তার নিত্যসঙ্গী। বর্তমানে ইউনূস আলী গড়ে ৬০ শতক জায়গার প্রশিক্ষণের শিক্ষণ অনুযায়ী কাঁকড়া চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। দুই হতে তিন সপ্তাহ ব্যাপী প্রতি সাইকেল কাঁকড়া চাষে গত বছর তার বিনিয়োগের পরিমান ছিল ২,০০,০০০ টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে তিনি ১৪-১৫ টি সাইকেল পরিচালনা করে প্রায় ৪,৫০০ কেজি কাঁকড়া উৎপাদন করেছেন এবং মুনাফা করেছেন প্রায় চার লক্ষ টাকা। তার কাঁকড়া চাষ কার্যক্রমে কর্মসংস্থান হয়েছে তিনজন লোকের। কাঁকড়া চাষের লভ্যাংশ দিয়ে অল্পদিনে তাঁর সংসারে উন্নতির ছোঁয়া লাগে, আসে মুক্তির স্বস্তি। পরিবারের সকলের আবদার সহজেই হাসিমুখে পূরণ করতে পারেন বলে আজ তিনি নিজেকে অনেক বেশি সুখী মানুষ মনে করেন।

যে সচ্ছলতা অর্জন তার একদিনের স্বপ্ন ছিল সে সচ্ছলতা এখন তাকে সবসময় ঘিরে থাকে। ইউনূস আলীর এ সাফল্য অনেকের ঈর্ষার কারন হলেও তাকে সবাই শ্রদ্ধাভরে অনুকরণ করতে চায়। আর ইউনূস আলী স্বপ্ন দেখেন একদিন আরো অনেক বড় হবে তাঁর এ কাঁকড়া চাষের কার্যক্রম, জাতীয় রপ্তানি আয়ে রাখতে পারবেন আরো বেশি ভূমিকা। তার কথা “বুঝে শুনে কাঁকড়া চাষ, সুখে কর বসবাস”।

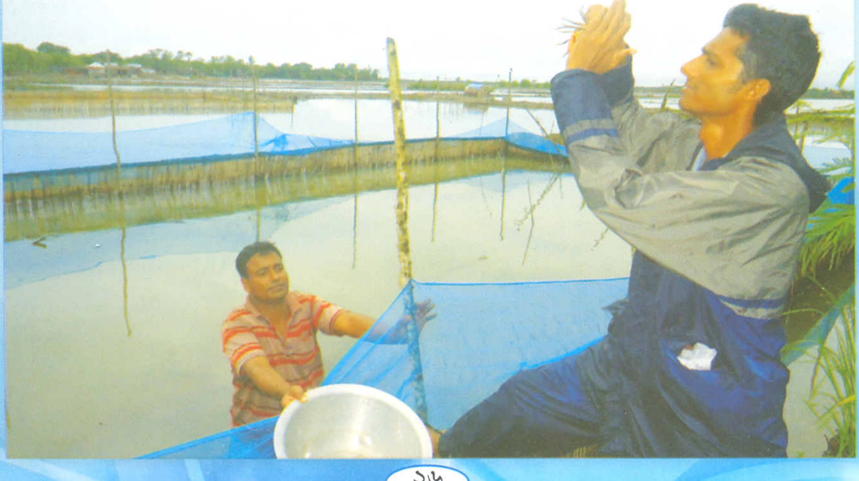

আলোকচিত্র ঃ কাঁকড়া চাষ প্রকল্প-১

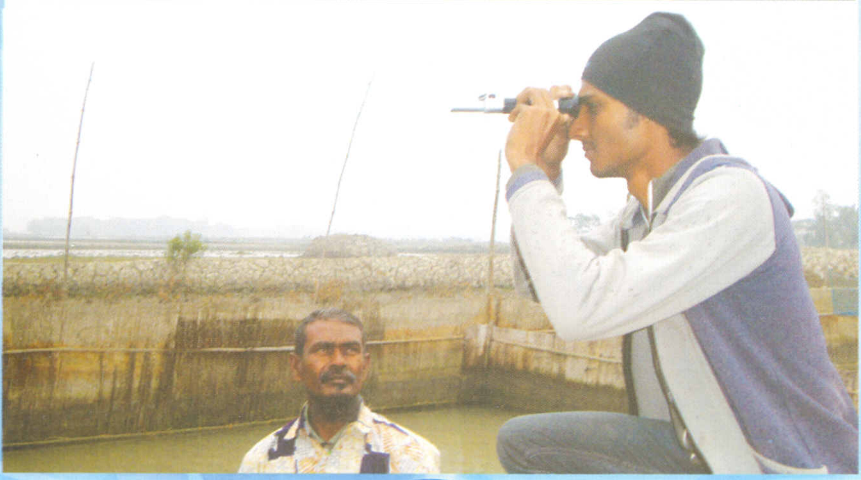

প্রশিক্ষণের নামঃ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায়, নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) কর্তৃক বাস্তবায়িত "কাঁকড়া চাষ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আলোকে একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন

GONOMUKHI NOWABENKI FOUNDATION
Shyamnagar, Satkhira

নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ)
নওয়বেঁকী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
ফোনঃ ০১৭১১২১৮১৯৭
ই-মেইলঃ ngfbd1@yahoo.com